

উৎসর্গ

উইলি পিয়র্সন্ বন্ধুবরেষু

আপনারে তুমি সহজে ভুলিয়া থাক,
 আমরা তোমারে ভুলিতে পারি না তাই।
 সবার পিছনে নিজের গোপনে রাখ,
 আমরা তোমারে প্রকাশ করিতে চাই।
 ছোটোরে কখনো ছোট নাহি কর মনে,
 আদর করিতে জান অনাদৃত জনে,
 প্রীতি তব কিছু না চাহে নিজের জন্য,
 তোমারে আদরি আপনারে করি ধন্য।

তোসা-মারু জাহাজ

বঙ্গসাগর

স্নেহাসক্ত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭ মে ১৯১৬

১

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
 ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
 আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।
 রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
 আজকে যে যা বলে বলুক তোরে,
 সকল তর্ক হেলায় তুচ্ছ ক'রে
 পুচ্ছটি তোর উচ্ছে তুলে নাচা।
 আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায় ;
 আর তো কিছুই নড়ে না রে
 ওদের ঘরে, ওদের ঘরের দাওয়ায়।
 ওই যে প্রবীণ, ওই যে পরম পাকা,
 চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
 বিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
 অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায়।
 আয় জীবন্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ,
 দেখে না যে বাণ ডেকেছে
 জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ।
 চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
 মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে,
 আছে অচল আসনখানা মেলে
 যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায়,
 আয় অশান্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা।
 হঠাৎ আলো দেখবে যখন
 ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা।
 সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে,

শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায়া
আয় প্রচণ্ড, আয় রে আমার কাঁচা।

শিকল-দেবীর ওই যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া।
পাগলামি তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অটুহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্ রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

আন্ রে টেনে বাঁধা-পথের শেষে।
বিবাগী কর্ অব্যাপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।
আপদ আছে, জানি অঘাত আছে,
তাই জেনে তো বক্ষে পরান নাচে,
ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথি-পোড়োর কাছে
পথে চলার বিধিবিধান যাচা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।

চিরযুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

সবুজ নেশায় ভোর করেছি ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরি তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মাল্যগাছা,
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।

রামগড়, ৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

২

এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।
 বেদনায় যে বান ডেকেছে
 রোদনে যায় ভেসে গো।
 রক্ত-মেঘে ঝিলিক মারে,
 বজ্র বাজে গহন-পারে,
 কোন্ পাগোল ওই বারে বারে
 উঠছে অটহেসে গো।
 এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

জীবন এবার মাতাল মরণ-বিহারে।
 এইবেলা নে বরণ ক'রে
 সব দিয়ে তোর ইহারে।
 চাহিস নে আর আগুপিছু,
 রাখিস নে তুই লুকিয়ে কিছু,
 চরণে কর্ মাথা নিচু
 সিন্ত আকুল কেশে গো।
 এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে।
 গৃহ আঁধার হল, প্রদীপ
 নিবল শয়ন-শিয়রে।
 ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে,
 এবার যে তোর ভিত নড়েছে,
 শুনিস নি কি ডাক পড়েছে
 নিরুদ্দেশের দেশে গো।
 এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

ছি ছি রে ওই চোখের জল আর ফেলিস নে।
 ঢাকিস নে মুখ ভয়ে ভয়ে
 কোণে আঁচল মেলিস নে।
 কিসের তরে চিত্ত বিকল,

ভাঙুক না তোর দ্বারের শিকল,
বাহিরপানে ছোট্ না, সকল
দুঃখসুখের শেষে গো।
এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো।

কণ্ঠে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটে না।
চরণে তোর রুদ্র তালে
নূপুর বেজে উঠবে না ?
এই লীলা তোর কপালে যে
লেখা ছিল-- সকল ত্যেজে
রক্তবাসে আয় রে সেজে
আয় না বধূর বেশে গো।
ওই বুঝি তোর এল সর্বনেশে গো।

রামগড়, ৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

৩

আমরা চলি সমুখপানে,
কে আমাদের বাঁধবে।
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে।
ছিঁড়ব বাধা রক্ত-পায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রক্ত মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।
মন ছড়াল আকাশ ব্যোপে,
আলোর নেশায় গেছি থেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের ধাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

সাগর-গিরি করব রে জয়,
যাব তাদের লজ্জা।
একলা পথে করি নে ভয়,
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।
আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গণ্ডী পেতে,
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।

রামগড়, ১২ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১

৪

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
 কেমন করে সহিবা।
 বাতাস আলো গেল মরে
 এ কী রে দুর্দৈবা।
 লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে,
 গান আছে যার ওঠ-না গেয়ে,
 চলবি যারা চল্ রে ধেয়ে,
 আয় না রে নিঃশঙ্ক।
 ধুলয় পড়ে রইল চেয়ে
 ওই যে অভয় শঙ্খ।

চলেছিলাম পূজার ঘরে
 সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।

খুঁজি সারাদিনের পরে
 কোথায় শান্তি-শর্গ।
 এবার আমার হৃদয়-ক্ষত
 ভেবেছিলাম হবে গত,
 ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
 হব নিষ্কলঙ্ক।
 পথে দেখি ধুলায় নত
 তোমার মহাশঙ্খ।

আরতি-দীপ এই কি জ্বালা।
 এই কি আমার সন্ধ্যা।
 গাঁথার রক্তজবার মালা ?
 হায় রজনীগন্ধা।
 ভেবেছিলাম যোঝায়ুঝি
 মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
 চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি,
 লব তোমার অঙ্ক।

হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।

যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।
নিশার বক্ষ বিদায় করে
উদ্‌বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও-না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।

জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষু।
জানি শ্রাবণধারা-সম
বাণ বাজিয়ে বক্ষে।
কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তির পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলাম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

৫

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
 ওই যে আমার নেয়ো
 ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
 আসছে তরী বেয়ো।

কালো রাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
 আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
 উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
 উধাও চলে ধৈয়ে।
 হেনকালে এ-দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
 কূলছাড়া মোর নেয়ো।

এমন রাতে উদাস হয়ে কেমন অভিসারে
 আসে আমার নেয়ো।
 সাদা পালের চমক দিয়ে নিবিড় অন্ধকারে
 আসছে তরী বেয়ো।
 কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
 পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
 কোন অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি
 রয়েছে পথ চেয়ে।
 অগৌরবার বাড়িয়ে গরব আপন সাথি
 বিরহী মোর নেয়ো।

এই তুফানে এই তিমিরে খোঁজে কেমন খোঁজা
 বিবাগী মোর নেয়ো।
 নাহি জানি পূর্ণ ক'রে কোন্ রতনের বোঝা
 আসছে তরী বেয়ো।
 নহে নহে, নাইকো মানিক, নাই রতনের ভার,
 একটি ফুলের গুচ্ছ আছে রজনীগন্ধার,
 সেইটি হাতে আঁধার রাতে সাগর হবে পার
 আনমনে গান গেয়ে।

কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে।

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।

তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।

রুম্ব অলক উড়ে পড়ে, সিন্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।

তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ওই যে আসে নেয়ে।

অনেক দেরি হয়ে গেছে বাহির হল কবে
উন্মনা মোর নেয়ে।

এখনো রাত হয় নি প্রভাত, অনেক দেরি হবে
আসতে তরী বেয়ে।

বাজবে নাকো তুরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে

নীরবে তার চিরদিনের ঘুচিবে সন্দেহ
কূলে আসবে নেয়ে।

এলাহাবাদ, ৩ কার্তিক, ১৩২১-রাত্রি

৬

তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা।
ওই যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ;

ওই যে যারা দিনরাত্রি
অলো-হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি
তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি।

চিরচঞ্চলের মাঝে তুমি কেন শান্ত হয়ে রও।
পথিকের সঙ্গ লও
ওগো পথহীন।
কেন রাত্রিদিন
সকলের মাঝে থেকে সবা হতে আছ এত দূরে
স্থিরতার চির অন্তঃপুরে।
এই ধূলি
ধূসর অঞ্চল তুলি
বায়ুভরে ধায় দিকে দিকে ;
বৈশাখে সে বিধবার আভরণ খুলি
তপস্বিনী ধরণীতে সাজায় গৈরিকে ;
অঙ্গে তার পত্রলিখা দেয় লিখে
বসন্তের মিলন-উষায়,
এই ধূলি এও সত্য হায় ;
এই তৃণ
বিশ্বের চরণতলে লীন
এরা যে অস্থির, তাই এরা সত্য সবি--
তুমি স্থির, তুমি ছবি,
তুমি শুধু ছবি।

একদিন এই পথে চলেছিলে আমাদের পাশে।

বক্ষ তব দুলিত নিশ্বাসে ;

অঙ্গে অঙ্গে প্রাণ তব

কত গানে কত নাচে

রচিয়াছে

আপনার হৃদ নব নব

বিশ্বতালে রেখে তাল ;

সে যে আজ হল কত কাল।

এ জীবনে

আমার ভুবনে

কত সত্য ছিলো।

মোর চক্ষে এ নিখিলে

দিকে দিকে তুমিই লিখিলে

রূপের তুলিকা ধরি রসের মুরতি।

সে-প্রভাতে তুমিই তো ছিলে

এ-বিশ্বের বাণী মূর্তিমতী।

একসাথে পথে যেতে যেতে

রজনীর আড়ালেতে

তুমি গেলে থামি।

তার পরে আমি

কত দুঃখে সুখে

রাত্রিদিন চলেছি সম্মুখে।

চলেছে জোয়ার-ভাঁটা আলোকে আঁধারে

আকাশ-পাথারে ;

পথের দুধারে

চলেছে ফুলের দল নীরব চরণে

বরনে বরনে ;

সহস্রধারায় ছোটো দুরন্ত জীবন-নির্বিরিণী

মরণের বাজায়ে কিঙ্কিণী।

অজানার সুরে

চলিয়াছি দূর হতে দূরে--

মেতেছি পথের প্রেমো

তুমি পথ হতে নেমে

যেখানে দাঁড়ালে
 সেখানেই আছ থেমে।
 এই তৃণ, এই ধূলি-- ওই তারা, ওই শশী-রবি
 সবার আড়ালে
 তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

কী প্রলাপ কহে কবি।
 তুমি ছবি ?
 নহে নহে, নও শুধু ছবি।
 কে বলে রয়েছ স্থির রেখার বন্ধনে
 নিস্তব্ধ ব্রহ্মন্দে।
 মরি মরি, সে আনন্দ থেমে যেত যদি
 এই নদী
 হারাত তরঙ্গবেগ,
 এই মেঘ
 মুছিয়া ফেলিত তার সোনার লিখন।
 তোমার চিকন
 চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
 তবে
 একদিন কবে
 চঞ্চল পবনে লীলায়িত
 মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
 হত স্বপনের।
 তোমায় কি গিয়েছিল ভুলে।
 তুমি যে নিয়েছ বাসা জীবনের মূলে
 তাই ভুল।
 অন্যমনে চলি পথে, ভুলি নে কি ফুলা
 ভুলি নে কি তারা।

তবুও তাহারা
 প্রাণের নিশ্বাসবায়ু করে সুমধুর,
 ভুলের শূন্যতা-মাঝে ভরি দেয় সুর।
 ভুলে থাকা নয় সে তো ভোলা ;
 বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছ যে দোলা।
 নয়নসম্মুখে তুমি নাই,

নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই ;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে ;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।
তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
তার পরে হারিয়েছি রাতে।
তার পরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।
নও ছবি, নও তুমি ছবি।

৭

এ কথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
 কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধন মান।
 শুধু তব অন্তরবেদনা
 চিরন্তন হয়ে থাক্ সন্ম্রাটের ছিল এ সাধনা।
 রাজশক্তি বজ্র সুকঠিন
 সন্ধ্যারভ্রাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
 কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
 নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সস্রবণ করুক আকাশ
 এই তব মনে ছিল আশা।
 হীরা মুক্তগমানিক্যের ঘটা
 যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
 যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
 শুধু থাক্
 একবিন্দু নয়নের জল
 কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
 এ তাজমহল।

হায় ওরে মানবহৃদয়,
 বার বার
 কারো পানে ফিরে চাহিবার
 নাই যে সময়,
 নাই নাই।
 জীবনের খরস্রোতে ভাসিছ সদাই
 ভুবনের ঘাটে ঘাটে--
 এক হাটে লও বোঝা, শূন্য করে দাও অন্য হাটে।
 দক্ষিণের মস্ত্রগুঞ্জরণে
 তব কুঞ্জবনে
 বসন্তের মাধবীমঞ্জরী
 যেই ক্ষণে দেয় ভরি
 মালধের চঞ্চল অঞ্চল,
 বিদায় গোধূলি আসে ধুলায় ছড়িয়ে ছিন্নদল।

সময় যে নাই ;
 আবার শিশিররাত্রে তাই
 নিকুঞ্জে ফুটায়ে তোল নব কুন্দরাজি
 সাজাইতে হেমন্তের অশ্রুভরা আনন্দের সাজি।

হায় রে হৃদয়,
 তোমার সঞ্চয়
 দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
 নাই নাই, নাই যে সময়।
 হে সম্রাট, তাই তব শঙ্কিত হৃদয়
 চেয়েছিল করিবারে সময়ের হৃদয় হরণ
 সৌন্দর্যে ভুলায়ে
 কণ্ঠে তার কী মালা দুলায়ে
 করিলে বরণ
 রূপহীন মরণেরে মৃত্যুহীন অপরূপ সাজে।
 রহে না যে
 বিলাপের অবকাশ
 বারো মাস,
 তাই তব অশান্ত ক্রন্দনে
 চিরমৌন জাল দিয়ে বেঁধে দিলে কঠিন বন্ধনে।
 জ্যোৎস্নারাতে নিভৃত মন্দিরে
 প্রেয়সীরে
 যে-নামে ডাকিতে ধীরে ধীরে
 সেই কানে-কানে ডাকা রেখে গেলে এইখানে
 অনন্তের কানো।
 প্রেমের করুণ কোমলতা
 ফুটিল তা
 সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে।
 হে সম্রাট কবি,
 এই তব হৃদয়ের ছবি,
 এই তব নব মেঘদূত,
 অপূর্ব অদ্ভুত
 ছন্দে গানে
 উঠিয়াছে অলঙ্কার পানে
 যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া

রয়েছে মিশিয়া
 প্রভাতের অরুণ-আভাসে,
 ক্লান্তসন্ধ্যা দিগন্তের করুণ নিশ্বাসে,
 পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্যবিলাসে,
 ভাষার অতীত তীরে
 কাঙাল নয়ন যেথা দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে।
 তোমার সৌন্দর্যদূত যুগ যুগ ধরি
 এড়াইয়া কালের প্রহরী
 চলিয়াছে বাক্যহারা এই বার্তা নিয়া
 “ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া”

চলে গেছ তুমি আজ
 মহারাজ ;
 রাজ্য তব স্বপ্নসম গেছে ছুটে,
 সিংহাসন গেছে টুটে ;
 তব সৈন্যদল
 যাদের চরনভরে ধরণী করিত টলমল
 তাহাদের স্মৃতি আজ বায়ুভরে
 উড়ে যায় দিল্লীর পথের ধূলি-’পরে।
 বন্দীরা গাহে না গান ;
 যমুনা-কল্লোলসাথে নহবত মিলায় না তান ;
 তব পুরসুন্দরীর নূপুরনিক্ণ
 ভগ্ন প্রাসাদের কোণে
 ম’রে গিয়ে ঝিল্লীস্বনে
 কাঁদায় রে নিশার গগন।
 তবুও তোমার দূত অমলিন,
 শান্তিক্লান্তিহীন,
 তুচ্ছ করি রাজ্য-ভাঙাগড়া,
 তুচ্ছ করি জীবনমৃত্যুর ওঠাপড়া,
 যুগে যুগান্তরে
 কহিতেছে একস্বরে
 চিরবিরহীর বাণী নিয়া
 “ভুলি নাই, ভুলি নাই, ভুলি নাই প্রিয়া”

মিথ্যা কথা-- কে বলে যে ভোল নাই।

কে বলে রে খোল নাই
 স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার।
 অতীতের চির অস্ত-অন্ধকার
 আজিও হৃদয় তব রেখেছে বাঁধিয়া ?
 বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়া
 আজিও সে হয় নি বাহির ?
 সমাধিমন্দির
 এক ঠাঁই রহে চিরস্থির ;
 ধরায় ধুলায় থাকি
 স্মরণের আবরণে মরণেরে যত্নে রাখে ঢাকি।
 জীবনেরে কে রাখিতে পারে।
 আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
 তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
 নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।
 স্মরণের গ্রন্থি টুটে
 সে যে যায় ছুটে
 বিশ্বপথে বন্ধনবিহীন।
 মহারাজ, কোনো মহারাজ্য কোনোদিন
 পারে নাই তোমারে ধরিতে ;
 সমুদ্রস্তনিত পৃথ্বী, হে বিরট, তোমারে ভরিতে
 নাই পারে--
 তাই এ-ধরারে
 জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
 মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।
 তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
 তাই তব জীবনের রথ
 পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
 বারম্বার।
 তাই
 চিহ্ন তব পড়ে আছে, তুমি হেথা নাই।
 যে প্রেম সম্মুখপানে
 চলিতে চালাতে নাই জানে,
 যে প্রেম পথের মধ্যে পেতেছিল নিজ সিংহাসন,
 তার বিলাসের সম্ভাষণ
 পথের ধুলার মতো জড়িয়ে ধরেছে তব পায়ে,

দিয়েছ তা ধূলিরে ফিরায়ে।
 সেই তব পশ্চাতের পদধূলি-’পরে
 তব চিত্ত হতে বায়ুভরে
 কখন সহসা
 উড়ে পড়েছিল বীজ জীবনের মাল্য হতে খসা।
 তুমি চলে গেছ দূরে
 সেই বীজ অমর অঙ্কুরে
 উঠেছে অম্বরপানে,
 কহিছে গম্ভীর গানে--
 ‘যত দূর চাই
 নাই নাই সে পথিক নাই।
 প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ
 রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
 আজি তার রথ
 চলিয়াছে রাত্রির আন্ধানে
 নক্ষত্রের গানে
 প্রভাতের সিংহদ্বার পানো।
 তাই
 স্মৃতিভারে আমি পড়ে আছি,
 ভারমুক্ত সে এখানে নাই’

এলাহাবাদ, ৩ পৌষ, ১৩২১-রাত্রি

৮

হে বিরাট নদী,
 অদৃশ্য নিঃশব্দ তব জল
 অবিচ্ছিন্ন অবিরল
 চলে নিরবধি।
 স্পন্দনে শিহরে শূন্য তব রুদ্র কায়াহীন বেগে ;
 বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
 পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা উঠে জেগে ;
 ক্রন্দসী কাঁদিয়া ওঠে বহিঃভরা মেঘে।
 আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
 ধাবমান অন্ধকার হতে ;
 ঘূর্ণচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
 স্তরে স্তরে
 সূর্যচন্দ্রতারা যত
 বুদ্ধবুদ্ধের মতো।

হে ভৈরবী, ওগো বৈরাগিনী,
 চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিনী,
 শব্দহীন সুরা
 অন্তহীন দূর
 তোমারে কি নিরন্তর দেয় সাড়া।
 সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।
 উন্মত্ত সে-অভিসারে
 তব বক্ষোহারে
 ঘন ঘন লাগে দোলা--ছড়ায় অমনি
 নক্ষত্রের মণি ;
 আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল ;
 দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল ;
 অঞ্চল আকুল
 গড়ায় কম্পিত ত্গে,
 চঞ্চল পল্লবপুঞ্জে বিপিনে বিপিনে ;
 বারম্বার ঝরে ঝরে পড়ে ফুল

জুঁই চাঁপা বকুল পারুল
 পথে পথে
 তোমার ঋতুর থালি হতো।
 শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
 উদ্দাম উধাও ;
 ফিরে নাহি চাও,
 যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
 কুড়িয়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
 নাই শোক, নাই ভয়,
 পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় করো ক্ষয়।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
 তুমি তাই
 পবিত্র সদাই।
 তোমার চরণস্পর্শে বিশ্বধূলি
 মলিনতা যায় ভুলি
 পলকে পলকে--
 মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।
 যদি তুমি মুহূর্তের তরে
 ক্লান্তিভরে
 দাঁড়াও থমকি,
 তখনি চমকি
 উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;
 পঙ্খ মুক কবন্ধ বধির আঁধা
 স্থূলতনু ভয়ংকরী বাধা
 সবারে ঠেকায় দিয়ে দাঁড়াইবে পথে ;
 অণুতম পরমাণু আপনার ভারে
 সঞ্চয়ের অচল বিকারে
 বিদ্ধ হবে আকাশের মর্মমূলে
 কলুষের বেদনার শূলে।
 ওগো নটী, চঞ্চল অপরী,
 অলক্ষ্য সুন্দরী
 তব নৃত্যমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
 তুলিতেছে শুচি করি
 মৃত্যুস্নানে বিশ্বের জীবন।

নিঃশেষে নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।

ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
 ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা,
 অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।
 নাড়ীতে নাড়ীতে তোর চঞ্চলের শুনি পদধ্বনি,
 বক্ষ তোর উঠে রনরনি।
 নাহি জানে কেউ
 রক্তে তোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ,
 কাঁপে আজি অরণ্যের ব্যাকুলতা ;
 মনে আজি পড়ে সেই কথা--
 যুগে যুগে এসেছি চলিয়া,
 স্থলিয়া স্থলিয়া
 চুপে চুপে
 রূপ হতে রূপে
 প্রাণ হতে প্রাণে।
 নিশীথে প্রভাতে
 যা কিছু পেয়েছি হাতে
 এসেছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে,
 গান হতে গানো।

ওরে দেখ্ সেই স্রোত হয়েছে মুখর,
 তরলী কাঁপিছে থরথর।
 তীরের সঞ্চয় তোর পড়ে থাক্ তীরে,
 তাকাস নে ফিরে।
 সম্মুখের বাণী
 নিক তোরে টানি
 মহাস্রোতে
 পশ্চাতের কোলাহল হতে
 অতল আঁধারে -- অকূল আলোতে।

এলাহাবাদ, ৫ পৌষ, ১৩২১ - প্রভাতে

৯

কে তোমারে দিল প্রাণ
 রে পাষণ।
 কে তোমারে জোগাইছে এ অমৃতরস
 বরষ বরষ।
 তাই দেবলোকপানে নিত্য তুমি রাখিয়াছ ধরি
 ধরণীর আনন্দমঞ্জরী ;
 তাই তো তোমারে ঘিরি বহে বারোমাস
 অবসন্ন বসন্তের বিদায়ের বিষণ্ণ নিশ্বাস ;
 মিলনরজনীপ্রাপ্তে ক্লান্ত চোখে
 ম্লান দীপালোকে
 ফুরিয়ে গিয়াছে যত অশ্রু-গলা গান
 তোমার অন্তরে তারা আজিও জাগিছে অফুরান,
 হে পাষণ, অমর পাষণ।

বিদীর্ণ হৃদয় হতে বাহিরে আনিল বহি
 সে রাজবিরহী
 বিরহের রক্তখানি ;
 দিল আনি
 বিশ্বলোক-হাতে
 সবার সাক্ষাতে।
 নাই সেথা সম্রাটের প্রহরী সৈনিক,
 ঘিরিয়া ধরেছে তারে দশ দিক।
 আকাশ তাহার 'পরে
 যত্নভরে
 রেখে দেয় নীরব চুপ্ত
 চিরন্তন ;
 প্রথম মিলনপ্রভা
 রক্তশোভা
 দেয় তারে প্রভাত-অরুণ,
 বিরহের ম্লানহাসে
 পাণ্ডুভাসে

জ্যোৎস্না তারে করিছে করুণা

সম্রাটমহিষী,
তোমার প্রেমের স্মৃতি সৌন্দর্যে হয়েছে মহীয়সী।
সে-স্মৃতি তোমারে ছেড়ে
গেছে বেড়ে
সর্বলোকে
জীবনের অক্ষয় আলোকে।

অঙ্গ ধরি সে অনঙ্গস্মৃতি
বিশ্বের প্রীতির মাঝে মিলাইছে সম্রাটের প্রীতি।
রাজ-অন্তঃপুর হতে আনিল বাহিরে
গৌরবমুকুট তব, পরাইল সকলের শিরে
যেথা যার রয়েছে প্রেয়সী
রাজার প্রাসাদ হতে দীনের কুটিরে--
তোমার প্রেমের স্মৃতি সবারে করিল মহীয়সী।

সম্রাটের মন,
সম্রাটের ধনজন
এই রাজকীর্তি হতে করিয়াছে বিদায়গ্রহণ।
আজ সর্বমানবের অনন্ত বেদনা
এ পষণ-সুন্দরীরে
আলিঙ্গনে ঘিরে
রাত্রিদিন করিছে সাধনা।

১০

হে প্রিয়, আজি এ প্রাতে
 নিজ হাতে
 কী তোমারে দিব দান।
 প্রভাতের গান ?
 প্রভাত যে ক্লান্ত হয় তপ্ত রবিকরে
 আপনার বৃন্তটির 'পরে ;
 অবসন্ন গান
 হয় অবসান।

হে বন্ধু কী চাও তুমি দিবসের শেষে
 মোর দ্বারে এসে।
 কী তোমারে দিব আনি।
 সন্ধ্যাদীপখানি ?
 এ-দীপের আলো এ যে নিরালা কোণের,
 স্তব্ধ ভবনের।
 তোমার চলার পথে এরে নিতে চাও জনতায় ?
 এ যে হয়
 পথের বাতাসে নিবে যায়।

কী মোর শক্তি আছে তোমারে যে দিব উপহার।
 হোক ফুল, হোক-না গলার হার,
 তার ভার
 কেনই বা সবে,
 একদিন যবে
 নিশ্চিত শুকাবে তারা ম্লান ছিন্ন হবে।
 নিজ হাতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
 তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
 যাবে ভুলি--
 ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।
 তার চেয়ে যবে

ক্ষণকাল অবকাশ হবে,
 বসন্তে আমার পুষ্পবনে
 চলিতে চলিতে অন্যমনে
 অজানা গোপন গন্ধে পুলকে চমকি
 দাঁড়াবে থমকি,
 পথহারা সেই উপহার
 হবে সে তোমার।
 যেতে যেতে বীথিকায় মোর
 চোখেতে লাগিবে ঘোর,
 দেখিবে সহসা--
 সন্ধ্যার কবরী হতে খসা
 একটি রঙিন আলো কাঁপি থরথরে
 ছোঁয়ায় পরশমণি স্বপনের 'পরে,
 সেই আলো, অজানা সে উপহার
 সেই তো তোমার।

আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
 দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
 বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
 চলে যায় চকিতে নূপুরে।
 সেথা পথ নাহি জানি,
 সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।
 বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
 আপনার ভাবে,
 না-চাহিতে না-জানিতে সেই উপহার
 সেই তো তোমার।
 আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান--
 হোক ফুল, হোক তাহা গান।

১১

হে মোর সুন্দর,
 যেতে যেতে
 পথের প্রমোদে মেতে
 যখন তোমার গায়
 কারা সবে ধুলা দিয়ে যায়,
 আমার অন্তর
 করে হয় হয়।
 কেঁদে বলি, হে মোর সুন্দর,
 আজ তুমি হও দণ্ডধর,
 করহ বিচার।
 তার পরে দেখি,
 এ কী,
 খোলা তব বিচারঘরের দ্বার,
 নিত্য চলে তোমার বিচার।
 নীরবে প্রভাত-আলো পড়ে
 তাদের কলুষরক্ত নয়নের 'পরে ;
 শুভ্র বনমল্লিকার বাস
 স্পর্শ করে লালসার উদ্দীপ্ত নিশ্বাস ;
 সন্ধ্যাতাপসীর হাতে জ্বালা
 সপ্তর্ষির পূজাদীপমালা
 তাদের মন্ততাপানে সারারাত্রি চায়--
 হে সুন্দর, তব গায়
 ধুলা দিয়ে যারা চলে যায়।
 হে সুন্দর,
 তোমার বিচারঘর
 পুষ্পবনে,
 পুণ্যসমীরণে,
 তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জে,
 বসন্তের বিহঙ্গকুঞ্জে,
 তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে।

প্রেমিক আমার,
 তারা যে নির্দয় ঘোর, তাদের যে আবেগ দুর্বীরা
 লুকায়ে ফেরে যে তারা করিতে হরণ
 তব আভরণ,
 সাজাবারে
 আপনার নগ্ন বাসনারো
 তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাস্ত্রে বাজে,
 সহিতে সে পারি না যে ;
 অশ্রু-আঁখি
 তোমারে কাঁদিয়া ডাকি--
 খড়গ ধরো, প্রেমিক আমার,
 করো গো বিচার।
 তার পরে দেখি
 এ কী,
 কোথা তব বিচার-আগার।
 জননীর স্নেহ-অশ্রু ঝরে
 তাদের উগ্রতা-পরে ;
 প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস
 তাদের বিদ্রোহশেল ক্ষতবিক্ষেপে করি লয় গ্রাস।
 প্রেমিক আমার,
 তোমার সে বিচার-আগার
 বিনীত স্নেহের স্তব্ধ নিঃশব্দ বেদনামাঝে,
 সতীর পবিত্র লাজে,
 সখার হৃদয়রক্তপাতে,
 পথ-চাওয়া প্রণয়ের বিচ্ছেদের রাতে,
 অশ্রুপ্লুত করুণার পরিপূর্ণ ক্ষমার প্রভাতে।

হে রক্ত আমার,
 লুপ্ত তারা, মুগ্ধ তারা, হয়ে পার
 তব সিংহদ্বার,
 সংগোপনে
 বিনা নিমন্ত্রণে
 সিঁধ কেটে চুরি করে তোমার ভাণ্ডার।
 চোরা ধন দুর্বহ সে ভার
 পলে পলে

তাহাদের মর্ম দলে,
 সাধ্য নাহি রহে নামাবার।
 তোমারে কাঁদিয়া তবে কহি বারম্বার--
 এদের মার্জনা করো, হে রুদ্র আমার।
 চেয়ে দেখি মার্জনা যে নামে এসে
 প্রচণ্ড ঝঞ্ঝার বেশে ;
 সেই ঝড়ে
 ধুলায় তাহারা পড়ে ;
 চুরির প্রকাণ্ড বোঝা খণ্ড খণ্ড হয়ে
 সে-বাতাসে কোথা যায় বয়ে।
 হে রুদ্র আমার,
 মার্জনা তোমার
 গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
 সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
 রক্তের বর্ষণে,
 অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।

১২

তুমি দেবে, তুমি মোরে দেবে,
 গেল দিন এই কথা নিত্য ভেবে ভেবে।
 সুখে দুঃখে উঠে নেবে
 বাড়ায়েছি হাত
 দিনরাত ;
 কেবল ভেবেছি, দেবে, দেবে,
 আরো কিছু দেবে।

দিলে, তুমি দিলে, শুধু দিলে ;
 কভু পলে পলে তিলে তিলে,
 কভু অকস্মাৎ বিপুল প্লাবনে
 দানের শ্রাবণে।
 নিয়েছি, ফেলেছি কত, দিয়েছি ছড়ায়ে,
 হাতে পায়ে রেখেছি জড়ায়ে
 জালের মতন ;
 দানের রতন
 লাগিয়েছি ধুলার খেলায়
 অযত্নে হেলায়,
 আলস্যের ভরে
 ফেলে গেছি ভাঙা খেলাঘরে।
 তবু তুমি দিলে, শুধু দিলে, শুধু দিলে,
 তোমার দানের পাত্র নিত্য ভরে উঠিছে নিখিলে।

অজস্র তোমার
 সে নিত্য দানের ভার
 আজি আর
 পারি না বহিতে।
 পারি না সহিতে
 এ ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা,
 দ্বারে তব নিত্য যাওয়া-আসা।
 যত পাই তত পেয়ে পেয়ে

তত চেয়ে চেয়ে
 পাওয়া মোর চাওয়া মোর শুধু বেড়ে যায় ;
 অনন্ত সে দায়
 সহিতে না পারি হায়
 জীবনে প্রভাত-সন্ধ্যা ভরিতে ভিক্ষায়।
 লবে তুমি, মোরে তুমি লবে, তুমি লবে,
 এ প্রার্থনা পুরাইবে কবো
 শূন্য পিপাসায় গড়া এ পেয়ালাখানি
 ধুলায় ফেলিয়া টানি,
 সারা রাত্রি পথ-চাওয়া কম্পিত আলোর
 প্রতীক্ষার দীপ মোর
 নিমেষে নিবায়ে
 নিশীথের বায়ে,
 আমার কণ্ঠের মালা তোমার গলায় প'রে
 লবে মোরে লবে মোরে
 তোমার দানের জুপ হতে
 তব রিক্ত আকাশের অন্তহীন নির্মল আলোতে।

সুরঙ্গল, ২৩ পৌষ, ১৩২১

১৩

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
 আজি কী কারণে
 টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
 নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
 আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
 চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
 শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
 ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
 সহসা কী মনে ক'রে
 পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
 উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
 অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে--
 আছি আমি অনন্তের দেশে
 যৌবন তোমার
 চিরদিনকার।
 গলে মোর মন্দারের মালা,
 পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।
 বিরহী তোমার লাগি
 আছি জাগি
 দক্ষিণ-বাতাসে
 ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
 আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
 কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।

লিখেছে সে--
 এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
 মরণের সিংহদ্বার

হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

শান্তিনিকেতন, ২৬ পৌষ, ১৩২১

১৪

কত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে
ধরণীর তলে
ফুটিয়াছে আজি এ মাধবী।
এ আনন্দছবি
যুগে যুগে ঢাকা ছিল অলঙ্কার বক্ষের আঁচলে।

সেইমতো আমার স্বপনে
কোনো দূর যুগান্তরে বসন্তকাননে
কোনো এক কোণে
একবেলাকার মুখে একটুকু হাসি
উঠিবে বিকাশি--
এই আশা গভীর গোপনে
আছে মোর মনে।

সুরঙ্গল, ২৭ পৌষ, ১৩২১

১৫

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
 যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করে নি অচল।
 মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
 আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।
 বাসা নাই, নাইকো সঞ্চয়,
 অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইকো নিশ্চয়।

যেদিন-শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
 দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
 আমার শৈবালদল
 উদ্দাম চঞ্চল,
 বন্যার ধারায়
 পথ যে হারায়
 দেশে দেশে
 দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

সুরঙ্গল, ২৭ পৌষ, ১৩২১

১৬

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
 উঠে অটুহাসি ;
 ধূলা বালি
 দিয়ে করতালি
 নিত্য নিত্য
 করে নৃত্য
 দিকে দিকে দলে দলে ;
 আকাশে শিশুর মতো অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
 অসংখ্য কামনা,
 রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
 তাদের খেলায় হতে সাথি।
 স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
 খুঁজে মরে কূল ;
 অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
 চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি
 কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
 ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
 চিন্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
 জুপে জুপে
 উঠিতেছে ভরি--
 সেই তো নগরী।
 এ তো শুধু নহে ঘর,
 নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
 শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি ;
 খোঁজে তারা আমার বাণীরে
 লোকালয়-তীরে-তীরে।
 আলোকতীরের পথে আলোহীন সেই যাত্রীদল

চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
 তাদের নীরব কোলাহলে
 অক্ষুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
 মোর চিত্তগুহা ছাড়ি,
 দেয় পাড়ি
 অদৃশ্যের অন্ধ মরু ব্যগ্র উর্ধ্বশ্বাসে
 আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কী জানি কে তারা কবে
 কোথা পার হবে
 যুগান্তরে,
 দূর সৃষ্টি-পরে
 পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে।
 আজ তারা কোথা হতে
 মেলেছিল ডানা
 সেদিন তা রহিবে অজানা।
 অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
 বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি
 গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্যচূড়ে,
 সেই রাজপুরে
 আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
 তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
 অরচিত দূর যজ্ঞভূমে।
 কামানের ধূমে
 কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
 রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম।

সুরঙ্গল, ২৮ পৌষ, ১৩২১

১৭

হে ভুবন
আমি যতক্ষণ
তোমারে না বেসেছি নু ভালো
ততক্ষণ তব আলো
খুঁজে খুঁজে পায় নাই তার সব ধন।
ততক্ষণ
নিখিল গগন
হাতে নিয়ে দীপ তার শূন্যে শূন্যে ছিল পথ চেয়ে।

মোর প্রেম এল গান গেয়ে ;
কী যে হল কানাকানি
দিল সে তোমার গলে আপন গলার মালাখানি।
মুগ্ধচক্ষে হেসে
তোমারে সে
গোপনে দিয়েছে কিছু যা তোমার গোপন হৃদয়ে
তারার মালার মাঝে চিরদিন রবে গাঁথা হয়ে।

সুরঙ্গল, ২৯ পৌষ, ১৩২১-প্রাতঃকাল

১৮

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
 ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
 যতকিছু বস্তুভার।
 ততক্ষণ নয়নে আমার
 নিদ্রা নাই ;
 ততক্ষণ এ বিশ্বে কেটে কেটে খাই
 কীটের মতন ;
 ততক্ষণ
 চারি দিকে নেমে নেমে আসে আবরণ ;
 দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন ;
 এ জীবন
 সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
 বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পঙ্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে-চলার বেগে
 বিশ্বের আঘাত লেগে
 আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
 বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
 হতে থাকে ক্ষয়।
 পুণ্য হই সে-চলার স্নানে,
 চলার অমৃত পানে
 নবীন যৌবন
 বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই--
 চিরদিন সম্মুখের পানে চাই
 কেন মিছে
 আমারে ডাকিস পিছে
 আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
 রব না ঘরের কোণে থেমো
 আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,

হাতে মোর তারি তো বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্ষিক্যের স্তূপাকার
আয়োজনা।

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

সুরঙ্গল, ২৯ পৌষ, ১৩২১-প্রাতঃকাল

১৯

আমি যে বেসেছি ভালো এই জগতেরে ;
 পাকে পাকে ফেরে ফেরে
 আমার জীবন দিয়ে জড়িয়েছি এরে ;
 প্রভাত-সন্ধ্যার
 আলো-অন্ধকার
 মোর চেতনায় গেছে ভেসে ;
 অবশেষে
 এক হয়ে গেছে আজ আমার জীবন
 আর আমার ভুবন।
 ভালোবাসিয়াছি এই জগতের আলো
 জীবনেরে তাই বাসি ভালো।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
 মোর বাণী
 একদিন এ-বাতাসে ফুটিবে না,
 মোর আঁখি এ-আলোকে লুটিবে না,
 মোর হিয়া ছুটিবে না
 অরণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে ;
 মোর কানে কানে
 রজনী কবে না তার রহস্যবারতা,
 শেষ করে যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

এমন একান্ত করে চাওয়া
 এও সত্য যত
 এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
 সেও সেই মতো।
 এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
 নহিলে নিখিল
 এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
 হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
 সব তার আলো

কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

রেলগাড়ি, ২৯ পৌষ, ১৩২১

২০

আনন্দ-গান উঠুক তবে বাজি
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।
অশ্রুজলের ঢেউয়ের 'পরে আজি
পারের তরী থাকুক ভাসিতে।

যাবার হাওয়া ওই যে উঠেছে--ওগো
ওই যে উঠেছে,
সারারাত্রি চক্ষে আমার
ঘুম যে ছুটেছে।

হৃদয় আমার উঠেছে দুলে দুলে
অকূল জলের অটহাসিতে,
কে গো তুমি দাও দেখি তান তুলে
এবার আমার ব্যথার বাঁশিতে।

হে অজানা, অজানা সুর নব
বাজাও আমার ব্যথার বাঁশিতে,
হঠাৎ এবার উজান হাওয়ায় তব
পারের তরী থাক্ না ভাসিতে।

কোনো কালে হয় নি যারে দেখা--ওগো
তারি বিরহে
এমন করে ডাক দিয়েছে,
ঘরে কে রহে।

বাসার আশা গিয়েছে মোর ঘুরে,
ঝাঁপ দিয়েছি আকাশরাশিতে ;
পাগল, তোমার সৃষ্টিছাড়া সুরে
তান দিয়ো মোর ব্যথার বাঁশিতে।

২১

ওরে তোদের ত্বর সহে না আর ?
 এখনো শীত হয় নি অবসান।
 পথের ধারে আভাস পেয়ে কার
 সবাই মিলে গেয়ে উঠিস গান ?
 ওরে পাগল চাঁপা, ওরে উন্মত্ত বকুল,
 কার তরে সব ছুটে এলি কৌতুকে আকুল।

মরণপথে তোরা প্রথম দল,
 ভাবলি নে তো সময় অসময়।
 শাখায় শাখায় তোদের কোলাহল
 গন্ধে রঙে ছড়ায় বনময়।
 সবার আগে উচ্ছে হেসে ঠেলাঠেলি করে
 উঠলি ফুটে, রাশি রাশি পড়লি ঝরে ঝরে।

বসন্ত সে আসবে যে ফাল্গুনে
 দখিন হাওয়ার জোয়ার-জলে ভাসি
 তাহার লাগি রইলি নে দিন গুণে
 আগে-ভাগেই বাজিয়ে দিলি বাঁশি।
 রাত না হতে পথের শেষে পৌঁছবি কোন্ মতে।
 যা ছিল তোর কেঁদে হেসে ছড়িয়ে দিলি পথে!

ওরে খ্যাপা, ওরে হিসাব-ভোলা,
 দূর হতে তার পায়ের শব্দে মেতে
 সেই অতিথির ঢাকতে পথের ধূলা
 তোরা আপন মরণ দিলি পেতে।
 না দেখে না শুনেই তোদের পড়ল বাঁধন খসে,
 চোখের দেখার অপেক্ষাতে রইলি নে আর বসে।

২২

যখন আমায় হাতে ধরে
 আদর করে
 ডাকলে তুমি আপন পাশে,
 রাত্রিদিবস ছিলেম ত্রাসে
 পাছে তোমার আদর হতে অসাবধানে কিছু হারাই,
 চলতে গিয়ে নিজের পথে
 যদি আপন ইচ্ছামতে
 কোনো দিকে এক পা বাড়াই,
 পাছে বিরাগ-কুশাঙ্কুরের একটি কাঁটা একটু মাড়াই।

মুক্তি, এবার মুক্তি আজি
 উঠল বাজি
 অনাদরের কঠিন ঘায়ে,
 অপমানের ঢাকে ঢোলে সকল নগর সকল গাঁয়ে।
 ওরে ছুটি, এবার ছুটি, এই যে আমার হল ছুটি,
 ভাঙল আমার মানের খুঁটি,
 খসল বেড়ি হাতে পায়ে ;
 এই যে এবার
 দেবার নেবার
 পথ খোলসা ডাইনে বাঁয়ে।

এতদিনে আবার মোরে
 বিষম জোরে
 ডাক দিয়েছে আকাশ পাতাল।
 লাঞ্ছিতেরে কে রে থামায়।
 ঘর-ছাড়ানো বাতাস আমায়
 মুক্তি-মদে করল মাতাল।
 খসে-পড়া তারার সাথে
 নিশীথরাতে
 ঝাঁপ দিয়েছি অতলপানে
 মরণ-টানো।

আমি-যে সেই বৈশাখী মেঘ বাঁধনছাড়া,
 ঝড় তাহারে দিল তাড়া ;
 সন্ধ্যারবির স্বর্ণকিরীট ফেলে দিল অস্তপারে,
 বজ্রমানিক দু'লিয়ে নিল গলার হারে ;
 একলা আপন তেজে
 ছুটল সে-যে
 অনাদরের মুক্তিপথের 'পরে
 তোমার চরণধুলায়-রঙিন চরম সমাদরে।

গর্ভ ছেড়ে মাটির 'পরে
 যখন পড়ে
 তখন ছেলে দেখে আপন মাকে।
 তোমার আদর যখন ঢাকে,
 জড়িয়ে থাকি তারি নাড়ীর পাকে,
 তখন তোমায় নাহি জানি।
 আঘাত হানি
 তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
 সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি,
 দেখি বদনখানি।

পদ্মাতীরে, ২০ মাঘ, ১৩২১

২৩

কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতে ছাড়া
একজনা উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

একজন তপোভঙ্গ করি
উচ্চহাস্য-অগ্নিরসে ফাল্গুনের সুরাপাত্র ভরি
নিয়ে যায় প্রাণমন হরি,
দু-হাতে ছড়ায় তারে বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে,
রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে,
নিদ্রাহীন যৌবনের গানো।

আরজন ফিরাইয়া আনে
অশ্রুর শিশির-স্নানে
স্নিগ্ধ বাসনায় ;
হেমন্তের হেমকান্ত সফল শান্তির পূর্ণতায় ;
ফিরাইয়া আনে
নিখিলের আশীর্বাদপানে
অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্যসুধায় মধুর।
ফিরাইয়া আনে ধীরে
জীবনমৃত্যুর
পবিত্র সংগমতীর্থতীরে
অনন্তের পূজার মন্দিরে।

২৪

স্বর্গ কোথায় জানিস কি তা ভাই
 তার ঠিক-ঠিকানা নাই
 তার আরম্ভ নাই, নাই রে তাহার শেষ,
 ওরে নাই রে তাহার দেশ,
 ওরে নাই রে তাহার দিশা,
 ওরে নাই রে দিবস, নাই রে তাহার নিশা।

ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
 ফাঁকির ফাঁকা ফানুস
 কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
 জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।
 স্বর্গ আজি ক্তার্থ তাই আমার দেহে,
 আমার প্রেমে, আমার স্নেহে,
 আমার ব্যাকুল বুকে,
 আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
 আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
 নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

আমার গানে স্বর্গ আজি
 ওঠে বাজি,
 আমার প্রাণে ঠিকানা তার পায়,
 আকাশভরা আনন্দে সে আমারে তাই চায়।
 দিগঙ্গনার অঙ্গনে আজ বাজল যে তাই শঙ্খ,
 সপ্ত সাগর বাজায় বিজয়-ডঙ্ক
 তাই ফুটেছে ফুল,
 বনের পাতায় ঝরনাধারায় তাই রে হুলুস্থুলা।
 স্বর্গ আমার জন্ম নিল মাটি-মায়ের কোলে
 বাতাসে সেই খবর ছোটো আনন্দ-কল্লোলো।

পদ্মা, ২০ মাঘ, ১৩২১

২৫

যে-বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দলবল
আমার প্রাঙ্গণতলে কলহাস্য তুলে
দাড়িসে পলাশগুচ্ছে কাঞ্চনে পারুলে ;
নবীন পল্লবে বনে বনে
বিহ্বল করিয়াছিল নীলাশ্বর রক্তিম চুশনে ;
সে আজ নিঃশব্দে আসে আমার নির্জনে ;
অনিমেঘে
নিস্তন্ধ বসিয়া থাকে নিভৃত ঘরের প্রান্তদেশে
চাহি সেই দিগন্তের পানে
শ্যামশ্রী মূর্ছিত হয়ে নীলিমায় মরিছে যেখানে।

পদ্মা, ২২ মাঘ, ১৩২১

২৬

এবারে ফাল্গুনের দিনে সিঙ্কুতীরের কুঞ্জবীথিকায়

এই যে আমার জীবন-লতিকায়

ফুটল কেবল শিউরে-ওঠা নতুন পাতা যত

রক্তবরন হৃদয়ব্যথার মতো ;

দখিন হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল,

উঠল কেবল মর্মর কল্লোলা

এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জে

বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।

আবার যেদিন আসবে আমার রূপের আগুন ফাল্গুনদিনের কাল

দখিন হাওয়ায় উড়িয়ে রঙিন পাল,

সেবারে এই সিঙ্কুতীরের কুঞ্জবীথিকায়

যেন আমার জীবন-লতিকায়

ফোটে প্রেমের সোনার বরন ফুল

হয় যেন আকুল

নবীন রবির আলোকটি তাই বনের প্রাঙ্গণে

আনন্দ মোর জনম নিয়ে

তালি দিয়ে তালি দিয়ে

নাচে যেন গানের গুঞ্জে।

পদ্মা, ২২ মাঘ, ১৩২১

২৭

আমার কাছে রাজা আমার রইল অজানা।
 তাই সে যখন তলব করে খাজানা
 মনে করি পালিয়ে গিয়ে দেব তারে ফাঁকি,
 রাখব দেনা বাকি।
 যেখানেতেই পালাই আমি গোপনে
 দিনে কাজের আড়ালেতে, রাতে স্বপনে,
 তলব তারি আসে
 নিশ্বাসে নিশ্বাসে।

তাই জেনেছি, আমি তাহার নইকো অজানা।
 তাই জেনেছি ঋণের দায়ে
 ডাইনে বাঁয়ে
 বিকিয়ে বাসা নাইকো আমার ঠিকানা।
 তাই ভেবেছি জীবন-মরণে
 যা আছে সব চুকিয়ে দেব চরণে।
 তাহার পরে
 নিজের জোরে
 নিজেরি স্বত্বে
 মিলবে আমার আপন বাসা তাঁহার রাজত্বে।

পদ্মাতীর, ২৪ মাঘ, ১৩২১

২৮

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

বাতাসেরে করেছ স্বাধীন,
সহজে সে ভৃত্য তব বন্ধনবিহীন।
আমারে দিয়েছ যত বোঝা,
তাই নিয়ে চলি পথে কভু বাঁকা কভু সোজা।
একে একে ফেলে ভার মরণে মরণে
নিয়ে যাই তোমার চরণে
একদিন রিক্তহস্ত সেবায় স্বাধীন ;
বন্ধন যা দিলে মোরে করি তারে মুক্তিতে বিলীন।

পূর্ণিমারে দিলে হাসি ;
সুখস্বপ্ন-রসরাশি
ঢালে তাই, ধরণীর করপুট সুধায় উচ্ছ্বাসি।
দুঃখখানি দিলে মোরে তপ্ত ভালে থুয়ে,
অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে
দিনশেষে মিলনের রাতে।

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্যহাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

আর সকলের তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।

আমি যাহা দিতে পারি আপনার প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।

পদ্মাতীরে, ২৫ মাঘ, ১৩২১

২৯

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
 আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
 সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওয়া ;
 এপার হতে ওপার বেয়ে
 বয় নি ধেয়ে
 কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
 শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।
 আমায় তুমি ফুলে ফুলে
 ফুটিয়ে তুলে
 দু'লিয়ে দিলে নানা রূপের দোলো।
 আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলো।
 আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
 ফিরে ফিরে নূতন করে পেলো।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
 আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
 আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
 জীবন-মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
 আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
 আমার মুখে চেয়ে
 আমার পরশ পেয়ে
 আপন পরশ পেলো।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুক ভয়,
 আমার মুখে ঘোমটা পড়ে রয় ;
 দেখতে তোমায় বাধে ব'লে পড়ে চোখের জল।
 ওগো আমার প্রভু,
 জানি আমি তবু
 আমায় দেখবে ব'লে তোমার অসীম কৌতূহল,

নইলে তো এই সূর্যতারা সকলি নিষ্ফল।

পদ্মাতীরে, ২৬ মাঘ, ১৩২১

৩০

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু-দিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তার পরে তার খবর কী যে ধারি নে তার ধার গো,
তার পরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই তো বাধায় সেই তো মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সামনে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ,
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই তো মুক্তি
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দয়া।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বুদ্ধজনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে।
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে।
ফিরবে না রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না,
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেছিস, পিছন তোরে ঘিরবে
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন ছিঁড়বে।

ঘন্টা যে ওই বাজল কবি, হোক রে সভাভঙ্গ,
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,

তাই তো দোলে বুকা
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।

পদ্মা, ২৭ মাঘ, ১৩২১

৩১

নিত্য তোমার পায়ের কাছে
তোমার বিশ্ব তোমার আছে
কোনোখানে অভাব কিছু নাই।
পূর্ণ তুমি, তাই
তোমার ধনে মানে তোমার আনন্দ না ঠেকে।
তাই তো একে একে
যা-কিছু ধন তোমার আছে আমার ক'রে লবো।
এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্যে তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নবা।
এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি, আপনি যে লও চিনে
আমার পরান করি হিরন্ময়।

পদ্মা, ২৭ মাঘ, ১৩২১

৩২

আজ এই দিনের শেষে
 সন্ধ্যা যে ওই মানিকখানি পরেছিল চিকন কালো কেশে
 গেঁথে নিলেম তারে
 এই তো আমার বিনিসুতার গোপন গলার হারো
 চক্রবাকের নিদ্রানীরব বিজন পদ্মাতীরে
 এই সে সন্ধ্যা ছুঁইয়ে গেল আমার নতশিরে
 নির্মাল্য তোমার
 আকাশ হয়ে পার ;
 ওই যে মরি মরি
 তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
 ওই যে সে তার সোনার চেলি
 দিল মেলি
 রাতের আঙিনায়
 ঘুমে অলস কায় ;
 ওই যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
 কালো ঘোড়ার রথে
 উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;
 একটি কেবল করুণ পরশ রেখে গেল একটি কবির ভালে ;
 তোমার ওই অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
 আর হবে না কভু।
 এমনি করেই প্রভু
 এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
 চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

পদ্মা, ২৭ মাঘ, ১৩২১

৩৩

জানি আমার পায়ের শব্দ রাত্রে দিনে শুনতে তুমি পাও,
 খুশি হয়ে পথের পানে চাও।
 খুশি তোমার ফুটে ওঠে শরৎ-আকাশে
 অরুণ-আভাসে।
 খুশি তোমার ফাগুনবনে আকুল হয়ে পড়ে
 ফুলের ঝড়ে ঝড়ে।
 আমি যতই চলি তোমার কাছে
 পথটি চিনে চিনে
 তোমার সাগর অধিক করে নাচে
 দিনের পরে দিনে।

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্যটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
 ফোটে তোমার মানস-সরোবরে--
 সূর্যতারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
 কৌতূহলের ভরে।
 তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরী
 পূর্ণ করে তোমার অঞ্জলি।
 তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে
 একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।

সুরঙ্গল, ২১ চৈত্র, ১৩২১

৩৪

আমার মনের জানলাটি আজ হঠাৎ গেল খুলে
তোমার মনের দিকে।
সকালবেলার আলোয় আমি সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

দেখতে পেলেম তুমি মোরে
সদাই ডাক যে-নাম ধরে
সে-নামটি এই চৈত্রমাসের পাতায় পাতায় ফুলে
আপনি দিলে লিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

আমার সুরের পর্দাটি আজ হঠাৎ গেল উড়ে
তোমার গানের পানো।
সকালবেলার আলো দেখি তোমার সুরে সুরে
ভরা আমার গানো।
মনে হল আমারি প্রাণ
তোমার বিশ্বে তুলেছে তান,
আপন গানের সুরগুলি সেই তোমার চরণমূলে
নেব আমি শিখে।
সকালবেলার আলোতে তাই সকল কর্ম ভুলে
রইনু অনিমিখে।

শ্রীনগর কাশ্মীর, ৭ কার্তিক, ১৩২২

৩৫

আজ প্রভাতের আকাশটি এই
 শিশির-ছলছল,
 নদীর ধারের ঝাউগুলি ওই
 রৌদ্রে ঝলমল,
 এমনি নিবিড় করে
 এরা দাঁড়ায় হৃদয় ভরে
 তাই তো আমি জানি
 বিপুল বিশ্বভুবনখনি
 অকূল মানস-সাগরজলে
 কমল টলমল।
 তাই তো আমি জানি
 আমি বাণীর সাথে বাণী,
 আমি গানের সাথে গান,
 আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
 আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
 আলোক জ্বলজ্বল।

শ্রীনগর, কার্তিক, ১৩২২

৩৬

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
 আঁধারে মলিন হল--যেন খাপে-ঢাকা
 বাঁকা তলোয়ার ;
 দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
 এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
 অন্ধকার গিরিতটতলে
 দেওদার তরু সারে সারে ;
 মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
 বলিতে না পারে স্পষ্ট করি,
 অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

সহসা শুনিবু সেই ক্ষণে
 সন্ধ্যার গগনে
 শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
 মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
 হে হংস-বলাকা,
 বাঙ্গা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
 রাশি রাশি আনন্দের অটুহাসে
 বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
 ওই পক্ষধ্বনি,
 শব্দময়ী অম্বর-রমণী
 গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি।
 উঠিল শিহরি
 গিরিশ্রেণী তিমির-মগন
 শিহরিল দেওদার-বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
 দিল আনি
 শুধু পলকের তরে
 পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
 বেগের আবেগ।

পৰ্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
 তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
 মাটির বন্ধন ফেলি
 ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
 আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
 এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
 সুদূরের লাগি,
 হে পাখা বিবাগী।
 বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে--
 “হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে”

হে হংস-বলাকা,
 আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা।
 শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
 শূন্যে জলে স্ফূর্তে
 অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
 তৃণদল
 মাটির আকাশ-পরে ঝাপটিছে ডানা,
 মাটির আঁধার-নীচে কে জানে ঠিকানা
 মেলিতেছে অক্ষুরের পাখা
 লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
 দেখিতেছি আমি আজি
 এই গিরিরাজি,
 এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
 দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
 নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
 চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।
 শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
 অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
 অস্পষ্ট অতীত হতে অস্পষ্ট সুদূর যুগান্তরে!
 শুনিলাম আপন অন্তরে
 অসংখ্য পাখির সাথে
 দিনেরাতে
 এই বাসাহাড়া পাখি ধায় আলো-অন্ধকারে
 কোন্‌ পার হতে কোন্‌ পারে।

ধুনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে--
“হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে”

কলিকাতা, ২৩ কার্তিক, ১৩২২

৩৭

দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন--
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোলা
বহিবন্যা-তরঙ্গের বেগ,
বিশ্বাস-ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন ;
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ--
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মতো হল শেষ,
পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচাকেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি--
“তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীরপানে
দিতে হবে পাড়ি”
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই দাঁড়-হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।

“নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আরা”
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আতঁরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।
ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে

কালোয় ঢেকেছে আলো--জানে না তো কেউ
 রাত্রি আছে কি না আছে ; দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ--
 তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী--
 “নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি”
 বাহিরিয়া এল কাঁরা। মা কাঁদিয়ে পিছে,
 প্রেয়সী দাঁড়িয়ে দ্বারে নয়ন মুদিয়ে
 ঝড়ের গর্জনমাঝে
 বিচ্ছেদের হাহাকার বাজে ;
 ঘরে ঘরে শূন্য হল আরামের শয্যাভল ;
 “যাত্রা করো, যাত্রীদল”
 উঠেছে আদেশ,
 “বন্দরের কাল হল শেষা”

মৃত্যু ভেদ করি
 দুলিয়া চলেছে তরী।
 কোথায় পৌঁছবে ঘাটে, কবে হবে পার,
 সময় তো নাই শুধাবার।
 এই শুধু জানিয়াছে সার
 তরঙ্গের সাথে লড়ি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
 টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
 আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল ;
 বাঁচি আর মরি
 বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
 এসেছে আদেশ--
 বন্দরের কাল হল শেষা

অজানা সমুদ্রতীর, অজানা সে-দেশ--
 সেথাকার লাগি
 উঠিয়াছে জাগি
 ঝটিকার কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান।
 মরণের গান
 উঠেছে ধুনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
 ঘোর অন্ধকারে।
 যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ, যত অমঙ্গল,

যত অশ্রুজল,
 যত হিংসা হলাহল,
 সমস্ত উঠিছে তরঙ্গিয়া,
 কূল উল্লঙ্ঘিয়া,
 উর্ধ্ব আকাশে ব্যঙ্গ করি।
 তবু বেয়ে তরী
 সব ঠেলে হতে হবে পার,
 কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
 শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
 চিন্তে নিয়ে আশা অন্তহীন,
 হে নির্ভীক, দুঃখ অভিহিত।
 ওরে ভাই, কার নিন্দা কর তুমি মাথা করো নত।
 এ আমার এ তোমার পাপ।
 বিধাতার বক্ষে এই তাপ
 বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়--
 ভীষ্ম ভীষ্মতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
 লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
 বঞ্চিতের নিত্য চিন্তাক্ষোভ,
 জাতি-অভিমান,
 মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান,
 বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
 ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্ফুল্বে বেড়ায় ফিরিয়া।
 ভাঙিয়া পড়ুক ঝড়, জাগুক তুফান,
 নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।
 রাখো নিন্দাবাগী, রাখো আপন সাধুত্ব আভিমান,
 শুধু একমনে হও পার
 এ প্রলয়-পারাবার
 নূতন সৃষ্টির উপকূলে
 নূতন বিজয়ধ্বজা তুলো।

দুঃখেই দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে ;
 অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে ;
 মৃত্যু করে লুকোচুরি
 সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
 ভেসে যায় তারা সরে যায়

জীবনে করে যায়
 ক্ষণিক বিদ্রূপ।
 আজ দেখো তাহাদের অভভেদী বিরাট স্বরূপ।
 তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
 বলো অকম্পিত বৃকে--
 “তোরে নাহি করি ভয়,
 এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
 তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
 শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন একা”

মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
 সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ সাথে যুঝে,
 পাপ যদি নাহি মরে যায়
 আপনার প্রকাশ-লজ্জায়,
 অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়,
 তবে ঘরছাড়া সবে
 অন্তরের কী আশ্বাস-রবে
 মরিতে ছুটিছে শত শত
 প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
 বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
 এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা।
 স্বর্গ কি হবে না কেনা।
 বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
 এত ঋণ ?
 রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।
 নিদারুণ দুঃখরাতে
 মৃত্যুঘাতে
 মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
 তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

৩৮

সর্বদেহের ব্যাকুলতা কী বলতে চায় বাণী,
 তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
 নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে দেখতে কি পায় কেউ।
 সেই নূতনের ঢেউ
 অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
 দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে তো দিলেম তারে, তবু হাজার বার
 নূতন করে দিই যে উপহার।
 চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
 নূতন হাসি ফোটে,
 তারি সঙ্গে, যতনভরা নূতন বসনখানি
 অঙ্গ আমার নূতন করে দেয়-যে তারি আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
 বেদনভরা শুধু চোখের গানে।
 মিলব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দৌঁছে একা,
 যেন নূতন দেখা।
 তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি।
 পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
 রঙের নেশায় মেটে না তার আশ,
 তাই তো বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
 কখনো জাফরানী,
 আজ তোরা দেখ্ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
 বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আসমানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ-যে দিশাহারার নীল,
 অন্য পারের বনের সাথে মিল।
 আজকে আমার সকল দেহে বইছে দূরের হাওয়া

সাগরপানে ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টিভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী।

৩৯

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
 ইংলণ্ডে দিকপ্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
 আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
 কেবল আপন ধন ; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি
 রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
 ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল-অন্তরালে
 বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
 পরীদের খেলার প্রাসঙ্গো দ্বীপের নিকুঞ্জতল
 তখনো ওঠে নি জেগে কবিসূর্য-বন্দনাসংগীতে।
 তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
 দিগন্তের কোল ছাড়ি শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
 উঠিয়াছ দীপ্তজ্যোতি মাধ্যাহ্নের গগনের 'পরে ;
 নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
 বিশুচিত্ত উদ্ভাসিয়া ; তাই হেরো যুগান্তর-শেষে
 ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জ আজি
 নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শিলাইদা, ৭ ফাল্গুন, ১৩২২

৪০

এইক্ষণে

মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়ন-বাতায়নে
 যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত-আলোতে
 সে-তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
 রহিয়া রহিয়া
 চিন্তে মোর আনিছে বহিয়া
 নীলিমার অপার সংগীত,
 নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারে বারে
 যে মোর স্মরণের দূর পরপারে
 দেখিয়াছ কত দেখা
 কত যুগে, কত লোকে, কত জনতায়, কত একা।
 সেই-সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
 ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
 বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।
 কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
 দেখিয়াছ কত ছলে
 চুপে চুপে
 এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
 জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনো
 তাই আজি নিখিল গগনে
 অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
 এক পূর্ণ বেদনায় ঝংকারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
 যাহা দেখিছ না তারি ভিড়।
 তাই আজি দক্ষিণ পবনে
 ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
 ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
 বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

৪১

যে-কথা বলিতে চাই,
 বলা হয় নাই,
 সে কেবল এই--
 চিরদিবসের বিশ্ব আঁখিসম্মুখেই
 দেখিনু সহস্রবার
 দুয়ারে আমার।
 অপরিচিতের এই চির পরিচয়
 এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়
 সে-কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী
 আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে ;
 নদীর এপারে ঢালু তটে
 চাষি করিতেছে চাষ ;
 উড়ে চলিয়াছে হাঁস
 ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলো।
 চলে কি না চলে
 ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
 আধো-জাগা নয়নের মতো।
 পথখানি বাঁকা
 বহুশত বরষের পদচিহ্ন-আঁকা
 চলেছে মাঠের ধারে, ফসল-খেতের যেন মিতা,
 নদীসাথে কুটিরের বহে কুটুস্থিত।

ফাল্গুনের এ-আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
 ওই খেয়াঘাট,
 ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
 নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে
 যেখানে বসায় মেলা-- এই সব ছবি
 কতদিন দেখিয়াছে কবি।
 শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,

এই আলো, এই হাওয়া,
এইমতো অক্ষুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

শিলাইদা, ৮ ফাল্গুন, ১৩২২

৪২

তোমারে কি বারবার করেছি অনুপমান।
 এসেছিলে গেয়ে গান
 ভোরবেলা ;
 ঘুম ভাঙাইলে ব'লে মেরেছি অনুচল
 বাতায়ন হতে,
 পরক্ষণে কোথা তুমি লুকাইলে জনতার স্রোতে।
 ক্ষুধিত দরিদ্রসম
 মধ্যাহ্নে, এসেছে দ্বারে মম।
 ভেবেছি, এ কী দায়,
 কাজের ব্যাঘাত এ-যো' দূর হতে করেছি বিদায়।

সন্ধ্যাবেলা এসেছিলে যেন মৃত্যুদূত
 জ্বালায়ে মশাল-আলো, অস্পষ্ট অঙ্কুর
 দুঃস্বপ্নের মতো।
 দস্যু ব'লে শত্রু ব'লে ঘরে দ্বার যত
 দিনু রোধ করি।
 গেলে চলি, অন্ধকার উঠিল শিহরি।
 এরি লাগি এসেছিলে, হে বন্ধু অজানা--
 তোমারে করিব মানা,
 তোমারে ফিরায়ে দিব, তোমারে মারিব,
 তোমা-কাছে যত ধার সকলি ধারিব,
 না করিয়া শোধ
 দুয়ার করিব রোধ।

তার পরে অর্ধরাতে
 দীপ-নেবা অন্ধকারে বসিয়া ধূলাতে
 মনে হবে আমি বড়ো একা
 যাহারে ফিরায়ে দিনু বিনা তারি দেখা।
 এ দীর্ঘ জীবন ধরি
 বহুমনে যাহাদের নিয়েছি বরি
 একত্র উৎসুক,

আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিল ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারেবারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।
বারেবারে ফিরে-যাওয়া অন্ধকারে বাজিবে হৃদয়ে
বারেবারে-ফিরে-আসা হয়ো।

৪৩

ভাবনা নিয়ে মরিস কেন খেপে।
 দুঃখ-সুখের লীলা
 ভাবিস এ কি রইবে বক্ষে চেপে
 জগদলন-শিলা।
 চলেছিস রে চলাচলের পথে
 কোন্ সারথির উধাও মনোরথে ?
 নিমেষতরে যুগে যুগান্তরে
 দিবে না রাশ-ঢিলা।

শিশু হয়ে এলি মায়ের কোলে,
 সেদিন গেল ভেসে।
 যৌবনেরি বিষম দোলার দোলে
 কাটল কেঁদে হেসে।
 রাত্রে যখন হচ্ছিল দীপ জ্বালা
 কোথায় ছিল আজকে দিনের পালা।
 আবার কবে কী সুর বাঁধা হবে
 আজকে পালার শেষে।

চলতে যাদের হবে চিরকালই
 নাইকো তাদের ভার।
 কোথা তাদের রইবে থলি-থালি,
 কোথা বা সংসার।
 দেহযাত্রা মেঘের খেয়া বাওয়া,
 মন তাহাদের ঘূর্ণা-পাকের হাওয়া ;
 বেঁকে বেঁকে আকার ঐকে ঐকে
 চলছে নিরাকার।

ওরে পথিক, ধর্-না চলার গান,
 বাজা রে একতারা।
 এই খুশিতেই মেতে উঠুক প্রাণ--
 নাইকো কূল-কিনারা।

পায়ে পায়ে পথের ধারে ধারে
কান্না-হাসির ফুল ফুটিয়ে যা রে,
প্রাণ-বসন্তে তুই-যে দখিন হাওয়া
গৃহ-বাঁধন-হারা!

এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ ;
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু,
সামনে সে-ও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির-নিরুদ্দেশ।

বঁধুর চিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।
প্রাণের ঢেউ সে এমনি করেই নাচে
এমনি ভালোবেসে।
সেখানেতে আবার সে কোন্ দূরে
আলোর বাঁশি বাজবে গো এই সুরে
কোন্ মুখেতে সেই অচেনা ফুল
ফুটেবে আবার হেসে।

এইখানে এক শিশির-ভরা প্রাতে
মেলেছিলাম প্রাণ।
এইখানে এক বীণা নিয়ে হাতে
সেধেছিলাম তান।
এতকালের সে মোর বীণাখানি
এইখানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি
নেব যে তার গান।

সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে

আমার ভুবন ঘিরে।
 শরতে সে শিউলি-বনের তলে
 ফুলের গন্ধে ঘোমটা টেনে চলে,
 ফাল্গুনে তার বরণমালাখানি
 পরাল মোর শিরে।

পথের বাঁকে হঠাৎ দেয় সে দেখা
 শুধু নিমেষতরে।
 সন্ধ্যা-আলোয় রয় সে বসে একা
 উদাস প্রাপ্তরে।
 এমনি করেই তার সে আসা-যাওয়া,
 এমনি করেই বেদন-ভরা হাওয়া
 হৃদয়-বনে বইয়ে সে যায় চলে
 মর্মরে মর্মরে।

জোয়ার-ভাঁটার নিত্য চলাচলে
 তার এই আনাগোনা।
 আধেক হাসি আধেক চোখের জলে
 মোদের চেনাশোনা।
 তারে নিয়ে হল না ঘর বাঁধা,
 পথে পথেই নিত্য তারে সাধা
 এমনি করেই আসা-যাওয়ার ডোরে
 প্রেমেরি জাল-বোনা।

৪৪

যৌবন রে, তুই কি রবি সুখের খাঁচাতো।
 তুই যে পারিস কাঁটাগাছের উচ্চ ডালের 'পরে
 পুচ্ছ নাচাতো।
 তুই পথহীন সাগরপারের পান্থ,
 তোর ডানা যে অশান্ত অক্লান্ত,
 অজানা তোর বাসার সন্ধানে রে
 অবাধ যে তোর ধাওয়া ;
 ঝড়ের থেকে বজ্রকে নেয় কেড়ে
 তোর যে দাবিদাওয়া।

যৌবন রে, তুই কি কাঙাল, আয়ুর ভিখারী।
 মরণ-বনের অন্ধকারে গহন কাঁটাপথে
 তুই যে শিকারি।
 মৃত্যু যে তার পাত্রে বহন করে
 অমৃতরস নিত্য তোমার তরে ;
 বসে আছে মানিনী তোর প্রিয়া
 মরণ-ঘোমটা টানি।
 সেই আবরণ দেখ্ রে উতারিয়া
 মুগ্ধ সে মুখখানি।

যৌবন রে, রয়েছ কোন্ তানের সাধনো।
 তোমার বাণী শুষ্ক পাতায় রয় কি কভু বাঁধা
 পুঁথির বাঁধনো।
 তোমার বাণী দখিন হাওয়ার বীণায়
 অরণ্যে আপনাকে তার চিনায়,
 তোমার বাণী জাগে প্রলয়মেঘে
 ঝড়ের ঝংকারে ;

ঢেউয়ের 'পরে বাজিয়ে চলে বেগে
 বিজয়-ডঙ্কা রে।

যৌবন রে, বন্দী কি তুই আপন গণ্ডিতে।
 বয়সের এই মায়াজালের বাঁধনখানা তোরে
 হবে খণ্ডিত।
 খড়গসম তোমার দীপ্ত শিখা
 ছিন্ন করুক জরার কুজ্জ্বটিকা,
 জীর্ণতারি বক্ষ দু-ফাঁক ক'রে
 অমর পুষ্প তব
 আলোকপানে লোকে লোকান্তরে
 ফুটুক নিত্য নবা।

যৌবন রে, তুই কি হবি ধুলায় লুপ্তিত।
 আবর্জনার বোঝা মাথায় আপন গ্লানিভারে
 রইবি কুণ্ঠিত ?
 প্রভাত যে তার সোনার মুকুটখানি
 তোমার তরে প্রত্যাশে দেয় আনি,
 আগুন আছে উর্ধ্ব শিখা জ্বলে
 তোমার সে যে কবি।
 সূর্য তোমার মুখে নয়ন মেলে
 দেখে আপন ছবি।

কলিকাতা, ৯ বৈশাখ, ১৩২৩

৪৫

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল ; ওরে যাত্রী।
তোমার পথের 'পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হতে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী ;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি
ধরার বন্ধন হতে নিয়ে যাক হরি
দিগন্তের পারে দিগন্তেরে।
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গুপ্তসর্প গূঢ়ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার--
সে তো নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,

এই তোর রুদ্রের প্রসাদ
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী।
ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক রে মদের পাত্র চুর।
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি ;
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী।
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক কেটে পুরাতন রাত্রি।